বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাত সহায়তা কর্মসূচী (এইচএসএসপি)

উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (এফটিপিপি)

মার্চ, ২০১৭

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

সূচীপত্র

	শব্দ সংক্ষেপ	৩
১.	পটভূমি	৪
২.	কর্মসূচীর বর্ণনা	৪
৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৬
৪.	উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (এফটিপিপি) এর পরিধি এবং উদ্দেশ্য	৭
৫.	এইচএসএসপি'র আওতায় 'উপজাতীয় জনগন'কে সংজ্ঞায়িত করণ	৭
৬.	বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী	৮
৭.	এফটিপিপির আওতায় আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১০
৮.	মত বিনিময় এবং অংশগ্রহণ	১৩
৯.	উপজাতীয় জনগোষ্ঠি সম্পর্কিত কর্মকান্ড জোরদারে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা	১৪
১০.	বাস্তবায়নের ব্যবস্থা	১৬
১১.	অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা	১৬
১২.	জনসমক্ষে এফটিপিপি প্রকাশ	১৭
১৩.	এফটিপিপি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন	১৮
১৪.	এফটিপিপি/ টিপিপি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন	১৮

শব্দ সংক্ষেপ

সিসি	কমিউনিটি ক্লিনিক
সিএইচটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
সিএইচটিআরসি অর আরসি	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
ডিজিএইচএস	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডিএলআইএস	বিতরণ সংযুক্ত সূচক
ডিপি	উন্নয়ন সহযোগী
এফটিপিপি	উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো
জিআরসি	দুর্দশা প্রতিকার কমিটি
এইচডিসি	পার্বত্য জেলা পরিষদ
এইচপিএনএসপি	স্বাস্থ্য, জন সংখ্যা এবং পুষ্টি খাত কর্মসূচি
এইচএসএসপি	স্বাস্থ্য খাত সহায়ক কর্মসূচি
আইপি	আদিবাসী জনগোষ্ঠী
এমওসিএইচটিএ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
এমওএইচএফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
পিসিজেএসএস অর জেএসএস	পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি
এসডিজিস	টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা
এসডব্লিউএপি	সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ
টিপি	উপজাতীয় জনগণ
টিপিপি	উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা

১। পটভূমি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) বিভিন্ন এইচএনপি সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সহ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা (এইচএনপি) খাতে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৪ সালে দেশটি বিশ্বব্যাংকের শ্রেণী বিন্যাসকৃত মাথাপিছু আয়ের সীমানা অতিক্রমের মধ্যদিয়ে একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৬ থেকে কমে ৪৬ হয়েছে, পাশাপাশি প্রতি এক লাখ প্রসবের ক্ষেত্রে মাতৃ মৃত্যু হার ৩৯৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮৮ তে দাঁড়িয়েছে। এসময় শিশুদের অপুষ্টির হারও হ্রাস পায় তবে এই হ্রাস পাওয়ার হার ছিল কিছুটা ধীর গতি সম্পন্ন। ২০০০ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টির হার ৫১ শতাংশে স্থির থাকলেও ২০১৪ সালে এই হার গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশে। যদিও এসময় কিছুটা অসমতা বিরাজমান ছিল যেমন পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪৯ শতাংশ অপুষ্টি শিশুদের অবস্থান ছিল আর্থসামাজিকভাবে সর্বনিম্নতম এক পঞ্চমাংশের মধ্যে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ এসডিজি-৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং জনকল্যাণ উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেবা, যার মাধ্যমে কোন রকম আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকেই এইচএনপির সেবারসমূহ প্রদানের নিশ্চিয়তাসহ সার্বজননী স্বাস্থ্য সেবার উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং এর উন্নয়ন সহযোগীরা (ডিপি) খাত ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য বছরওয়ারী বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন সরকারিও বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সরকার আনুমানিক ১৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত সাড়ে পাঁচ বছর সময়ের মেয়াদি (জানুয়ারী ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত) চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত (চতুর্থ এইচপিএনএসপি) কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছে।

চতুর্থ খাত কর্মসূচীর নিজস্ব কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে "একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশে মান সম্মত ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিক যাতে করে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ পেতে পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা"। এই উদ্দেশ্য কি, এসডিজির প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম ও মৌলিক কর্মসূচি। বিশ্বব্যাংক তাদের স্বাস্থ্য সেক্টর সহায়ক কর্মসূচি (এইচএসএসপি) এর মাধ্যমে এই কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে অবমুক্তি সংযুক্ত সূচক (ডিএলআইস) ব্যবহার করা হবে।

২। কর্মসূচির বর্ণনা

সুপ্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা, পরামর্শ প্রক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় কৌশলের পাশাপাশি পূর্ববর্তী খাত কর্মসূচি সমূহের সাফল্যজনক ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি বিনির্মাণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এই কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সহ এই প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের। বস্তুত: এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরগুলো হল: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এবং নার্সিং ও ধাত্রী অধিদপ্তর।

সরকারের স্বাস্থ্য সুবিধাদি কয়েকটি প্রশাসনিক পর্যায়ের পরিচালিত হচ্ছেঃ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড। এইচএসএসপি এর ডিএলআইএস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উপজেলা ও এর নীচের স্তরে সেবা প্রদান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে। একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর এই সেবাসমূহ প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সর্বনিম্ন স্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে (সিসি) এবং এটা হচ্ছে ওয়ার্ড পর্যায়ে টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদানসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রথম কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের লক্ষ্য হচ্ছে ৬০০০ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ; বর্তমানে ১৩,০৯৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা প্রদান করছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সুবিধাদির যথা কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন সাব-সেন্টার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র। এ সকল কেন্দ্রে চিকিৎসক ও মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে রোগীদের বহি:বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে ৩০-৫০ শয্যার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে কোন কোন কেন্দ্র থেকে

ফার্স্ট রেফারাল (সেকেন্ডারী) হিসেবে জরুরী সার্বিক ধাত্রী সেবাও প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন আকারের (১০০-২৫০ শয্যা) জেলা / জেনারেল হাসপাতাল থেকে সেকেন্ডারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি কিছু কিছু জেলায় সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে যেখান থেকে তৃতীয় ধাপের চিকিৎসা দেয়া হয়। উপরন্তু, জেলা পর্যায়ে ১০-২০ শয্যার মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে যেখান থেকে পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রসূতি সেবা প্রদান করা হয়। বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সরকার বেশ কিছু সংখ্যক টারশিয়ারি ও বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিচালনা করে আসছে।

এই কর্মসূচির তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছেঃ (i) মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়ন (ii) এইচএনপির ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং (iii) মান সম্মত এইচএনপি সেবা প্রদান। আশা করা হচ্ছে পূর্ববর্তী খাতওয়ারী কর্মসূচির মত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন সহযোগীরা (ডিপি) এই কর্মসূচিতে (অন বাজেট) অর্থায়ন করবে।

এই প্রকল্পের কম্পোনেন্টগুলো চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কর্মসূচির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং ডিএলআইএস এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ক্ষেত্রে ডিএলআইগুলো একটি ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এসডিজিস অর্জনে বাংলাদেশ যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলো উত্তরণ করা সম্ভব হয়। এই চ্যালেঞ্জসমূহকে তিনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ (ক) চলমান কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া ; (খ) অসমাপ্ত এমডিজি এজেন্ডা ; এবং (গ) উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ।

কম্পোনেন্ট ১. মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়ন

একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে থাকায় এসডিজিস অর্জনের অগ্রগতির ভিত রচনার জন্য বাংলাদেশকে বেশ কিছু ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ এর সমাধান করতে হবে। এর একটি প্রধান অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হচ্ছে ব্যবস্থাপনা এবং দায়বদ্ধতার উন্নয়নসহ জনগণকে সম্পৃক্ত করা, যা সরকারের চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। রোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে তাদের অভিযোগের ব্যাপারে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন এবং এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়য়ে একটি ওয়েব ভিত্তিক সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প সহায়তা করবে। এছাড়া, মধ্য মেয়াদে এসডিজিস লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মধ্য স্বাস্থ্য খাতে ব্যবৃদ্ধির একটি ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাজেট দক্ষতা ও বরাদ্দ উন্নয়নে সহায়তা দেবে। যা তহবিল প্রবাহ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সহায়তা হবে। অধিকন্তু, এই প্রকল্প মৌলিক সেবা প্রদানে সহায়তা করার লক্ষ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি ও এর বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এছাড়া সেবা প্রদান পর্যায়ে বাজেট ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমে এই প্রকল্প অবদান রাখবে।

কম্পোনেন্ট ২. এইচএনপির ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সরকারের সেবাদান প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারিখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার যা, এসডিজি অর্জনে প্রয়োজনীয় ভিত গড়ে তোলতে অবদান রাখবে। অতঃপর প্রকল্পের একটি প্রধান লক্ষ্যনীয় ক্ষেত্র হবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করা। প্রকল্পটি হেলথ্ ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরও উন্নয়নে সহায়তা করবে যা বর্তমানে যা বিভক্ত ও ডুপ্লিকেশন হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কম্পোনেন্ট ৩. মান সম্মত এইচএনপি সেবা প্রদান

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে তবে এই এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বেশ কিছু সেবা সম্পর্কিত সূচক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের ইংগিত দিচ্ছে (যেমন এক বছর বয়সী শিশুদের নির্ধারিত সব ধরণের টিকা নেয়ার হার ২০০৪ সালের ৭৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে) তবে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিসেবাসমূহের কভারেজের ক্ষেত্রে ধীর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে বিবাহিতা মহিলাদের (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী) বর্তমানে আধুনিক জন্মনিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সালে যে হার ছিল ৪৭ শতাংশ ২০১৪ সালে সেটি দাঁড়িয়েছে ৫৪ শতাংশে। একইভাবে বয়ঃপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি যথাযথভাবে নজর দেয়া হচ্ছে না বিশেষ করে বিবাহিত কিশোরী এবং তাঁদের শিশুদের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। অল্প বয়সীদের বিবাহের ঘটনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেলেও ২০১৪ সালে অবিবাহিত মেয়েদের প্রথম বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৬ বৎসর। পরিশেষে দেখা গেছে যক্ষ্মা (টিবি) এবং আরো কিছু উদীয়মান ব্যাধি সহ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের মত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কিছু এজেন্ডা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আঞ্চলিক পর্যায়ে সেবা প্রাপ্তির সুযোগ

এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসমতা রয়েছে । যেমন জাতীয় পর্যায়ে যেখানে বিবাহিত মহিলাদের মাঝে জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার হার ৫৪ শতাংশ হলেও চট্টগ্রাম বিভাগে এই হার ৪৭ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে ৪১ শতাংশ । সিলেট বিভাগে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রসূতি সেবার সুবিধা গ্রহণের হার মাত্র ২৩ শতাংশ ।

কম্পোনেন্ট – ৩ এর আওতায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাকরার জন্য কিছু কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সময়ের ব্যাপ্তি পরিসরে এদের গুরুত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও সরকারের পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নীতি ও কর্মসূচি উন্নয়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, সনাক্ত এবং ব্যবস্থাপনাএবং প্রাথমিক সেবাদান কর্মসূচি । এসকল অসমাপ্ত এবং উদিয়মান এজেন্ডার প্রেক্ষাপটে এই প্রকল্প বিদ্যমান অগ্রগতি বজায়ে রাখা, উচ্চ মাত্রার ব্যবহার অর্জন, মানোন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে ।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী

বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তাবিত এইচএসএসপি কর্মসূচি ২১ টি ডিএলআইস ব্যবহার করবে । এইচএসএসপি বাংলাদেশ সরকারের চতুর্থ খাত কর্মসূচির অংশবিশেষকে সহায়তা করবে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ কোটি মানুষ যারা বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে তাদের সহ সমগ্র বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের জন্য সুবিধা বয়ে আনবে । এইচএসএসপি কর্মসূচি ভূক্ত ২১ টির মধ্যে ১২ টি ডিএলআইস চট্টগ্রাম ও সিলেটে (বাংলাদেশের সাতটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে দু'টি) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবাদান কর্মসূচির উন্নয়নে অবদান রাখবে। জিওবির চতুর্থ খাত কর্মসূচির অংশ বিশেষের সহায়তার মাধ্যমে এইচএসএসপির প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য হচ্ছে এইচএনপি খাতের মূল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা এবং নির্ধারিত ভৌগোলিক এলাকার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় এইচএনপি সেবাসমূহ প্রদান ও ব্যবহারের উন্নয়ন সাধন করা । এইচএসএসপি সহায়তা প্রদান নিম্নোক্ত ডিএলআইএস বাস্তবায়ন করা হবে:

কম্পোনেন্ট ১. মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়ন
১। নাগরিকের অভিযোগ ব্যক্ত করার পদ্ধতি জোরদারকরণ ;
২। কর্মসূচির বাজেট ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ;
৩। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি ;
কম্পোনেন্ট ২. এইচএনপি ব্যবস্থাসমূহ জোরদারকরণ
৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণ ;
৫। সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন ;
৬। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন ;
৭। সংগ্রহ এবং ধারাবাহিক বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ ;
৮। ঔষধ মজুদ নজরদারী ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন ;
৯। মাতৃ সেবার উন্নয়নের জন্য ধাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ;
১০। ফার্স্ট রেফারাল সেবার যন্ত্রের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি করা ;
১১। তথ্য ব্যবস্থাসমূহ জোরদারকরণ ;
কম্পোনেন্ট ৩. মানসম্মত এইচএনপি নিশ্চিতকরণ
১২। মাতৃ স্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ;
১৩। প্রসবোত্তর পরিবার পরিকল্পনা সেবার উন্নয়ন ;
১৪। জরুরী মা ও শিশু সেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন ;

১৫। টিকাদান কর্মসূচি এবং সমতা জোরদার ;
১৬। বিদ্যালয় ভিত্তিক বয়ঃপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার উন্নয়ন ;
১৭। মাতৃ পুষ্টি সেবার সম্প্রসারণ ;
১৮। নবজাতক ও শিশুদের পুষ্টি সেবার সম্প্রসারণ ;
১৯। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের উন্নয়ন সাধন ;
২০ অসংক্রামক রোগ সেবার উন্নয়ন ;
২১। শহর ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ;

৪। উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (এফটিপিপি) এর পরিধি এবং উদ্দেশ্য

এইচএসএসপি কোন পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য অর্থায়ন করবে না এবং এ কারণে বিশ্বব্যাংক ৪.১২ নং ওপির অনৈচ্ছিক মাধ্যমে পূর্ণবাসনকে প্রভাবিত করবে না । আদিবাসী সংক্রান্ত ওপির ৪.১০ এর প্রতি দৃষ্টি গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বিশ্বব্যাংক এই মর্মে জানাচ্ছে যে, চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি কর্মসূচি সহ অন্যান্য যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প যে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের জন্য প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এর ফলে ঐ সকল জনগোষ্ঠি যাতে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং তারা যাতে সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এফটিপিপি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপি ৪.১০ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ।

- উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (টিপিস) এর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন এবং নির্মাণ কাজ ভালভাবে খতিয়ে দেখা এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্প নির্বাচন, নক্সা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কর্মকান্ডে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- অনিবার্য বিরূপ প্রভাব প্রশমনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংগতিপূর্ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- যেখানে সম্ভব সেখানেই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে এ সকল প্রভাব প্রশমনে – ক্ষতিগ্রস্থ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর (টিপি) আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাকে শক্তিশালী ও জোরদার করা ।
- পরিশেষে, শুধু সরকারি ভূমি রেকর্ডের ভিত্তিতে এমন কোন স্থান নির্বাচন করা যাবে না এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও যা সকলে বিদ্যমান ব্যবহার ও ব্যবহারকারীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৫। এইচএসএসপি'র আওতায় 'উপজাতীয় জনগন'কে সংজ্ঞায়িত করণ

ওপি ৪.১০ এ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এইচএসএসপি'র ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক 'উপজাতীয় জনগন' বলতে সেই 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' কেই বোঝাবে । তবে উপজাতীয় জনগণের বিচিত্র জীবন পদ্ধতি এবং পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের বসবাসের ফলে কোন একক সংজ্ঞার মাধ্যমে এই বৈচিত্রময় বিষয়টিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয় । এ কারণে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতি অনুসরণ মোতাবেক নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে যে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠী (টিপি) কে চিহ্নিত করবে : –

- একটি স্বতন্ত্র উপজাতীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আত্ন পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি ;
- ভৌগলিক দিক থেকে স্বতন্ত্র আবাসস্থলে দলবদ্ধভাবে বসবাস অথবা প্রকল্প এলাকা এবং ঐ আবাসস্থল ও সীমানার প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্বপুরুষদের সম্পদও অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হওয়া ;
- গতানুগতিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা হওয়া; এবং
- সংশ্লিষ্ট দেশ বা এলাকার সরকারি ভাষার সাথে ঐ নির্দিষ্ট উপজাতীয় ভাষার পার্থক্য থাকা ।

৬। বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ মূলতঃ ধর্মীয়, জাতিগত এবং ভাষাগত দিক থেকে মোটামুটি সম প্রকৃতির। দেশটির প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার আনুমানিক ৯০ শতাংশ মুসলমান এবং প্রায় ৭ শতাংশ হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, যার মধ্যে প্রধান দু'টি ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান। প্রায় ৯৯ ভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এদের বাঙ্গালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে, সারা দেশব্যাপী বেশ কিছু সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করছে যারা তাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিকও এবং ভাষাগত ঐতিহ্য ধরে রেখে চলেছে। অন্যভাবে বলা চলে, এসকল জাতি গোষ্ঠীর অনেক গুলোকেই বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ওপি ৪.১০ সহ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন দলিলে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেই অনুসারে 'আদিবাসী জনগণ' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তবে তাদের জনসংখ্যার প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক রয়ে গেছে। সরকারি পরিসংখ্যানে সবচেয়ে বেশী ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়; অতি সাম্প্রতিক আদম শুমারীতে (২০১১) বিভিন্ন উপজাতির পৃথক পৃথক সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাব হচ্ছে ১৯৯১ সালে সম্পন্নকৃত আদম শুমারী, যেখানে এসকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২ লক্ষ। দেশের গড় জনমিতিক প্রবৃদ্ধির হারকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে এদের বর্তমান মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। তবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ শুমারীতে প্রদত্ত এই সংখ্যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শীর্ষ এবং নেটওয়ার্কিং সংগঠন 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' বলেছে যে তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। তবে কোনক্রমেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক থেকে দুই শতাংশের বেশী হবে না।

উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর মোট সংখ্যা সম্পর্কেও মত পার্থক্য রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে এ ধরণের ২৯টি গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। সম্প্রতি গৃহীত সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন (এপ্রিল ২০১০) এ ২৭টি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। তবে বর্তমানে এ আইন সংশোধন করা হচ্ছে এবং এর ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রস্তাব করতে পারে। 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' তাদের একটি প্রকাশনায় (সলিডারিটি, ২০০৩) ৪৫টি পর্যন্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছে। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক বাংলাদেশ সংসদীয় ককাস 'বাংলাদেশ আদিবাসী জনগণের অধিকার আইন' শীর্ষক একটি খসড়া আইনে এর প্রস্তাব করেছে যাতে ৫৯টি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিষয় উল্লেখ রয়েছে। একদল সংসদ সদস্য নিয়ে গঠিত এই ককাস দেশের উপজাতীয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরালো বক্তব্য প্রদান করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিষয়টি জোরদার হওয়ার আংশিক কারণ হচ্ছে সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক আন্দোলন – বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে - এবং নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত করার ব্যাপারে একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর মাঝে ক্রমবর্ধমানহারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া।

যদিও বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে তাদের সিংহভাগের অবস্থান বেশ কয়েকটি ভৌগলিক এলাকায় কেন্দ্রীভুত থাকতে দেখা যায়; সেগুলো হল পার্বত্য চট্টগ্রাম এর দক্ষিন-পূর্ব কোণে সবচেয়ে বেশী জন ঘনত্ব সহ উত্তর-পশ্চিম (রাজশাহী ও দিনাজপুর), উত্তর-পূর্ব (সিলেট), কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা ও ময়মনসিংহ), দক্ষিণ (বরিশাল ও পটুয়াখালী)। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থানকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে (নিম্নে উল্লেখিত ম্যাপে বাংলাদেশের সে সব ভৌগলিক অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থান বেশী সেই সকল অঞ্চলকে দেখানো হয়েছে) ;

- উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (রাজশাহী বিভাগ-যার মধ্যে রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ্ পাবনা, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, বগুড়া এবং গাইবান্ধা জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল-সাঁওতাল, উরাও / ওঁরাও, মুন্ডা, মাহাতো, পাহাড়িয়া, মালো, পাহান, রাজবংশী, রাজুয়াড়, কর্মকার এবং তেলি ;

- উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (সিলেট বিভাগ-যার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভি বাজার জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল-খাসিয়া, পাত্র, মনিপুরী, গারো, ত্রিপুরা এবং চা বাগানের সম্প্রদায় সমূহ)
- কেন্দ্রীয় অঞ্চল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-যার মধ্যে রয়েছে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর জামালপুর, নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহ) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল-গারো, হাজং, কোচ, বানাই, রাজবংশী, ডালু, বর্মণ এবং হোদি ।
- উপকূলীয় অঞ্চল (খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগ - যার মধ্যে রয়েছে পটুয়াখালী, বরগুনা, চাঁদপুর চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা এবং সাতক্ষীরা) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল-রাখাইন, ত্রিপুরা, মুন্ডা এবং রাজবংশী ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল-চাকমা, রাখাইন, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চগ্যা, ম্রো, লুসাই, খিয়াং, খুমি, চাক, পাংখুয়া, বম, সাঁওতাল, রাখাইন, অসম/অহমিয়া এবং গোর্খা ।

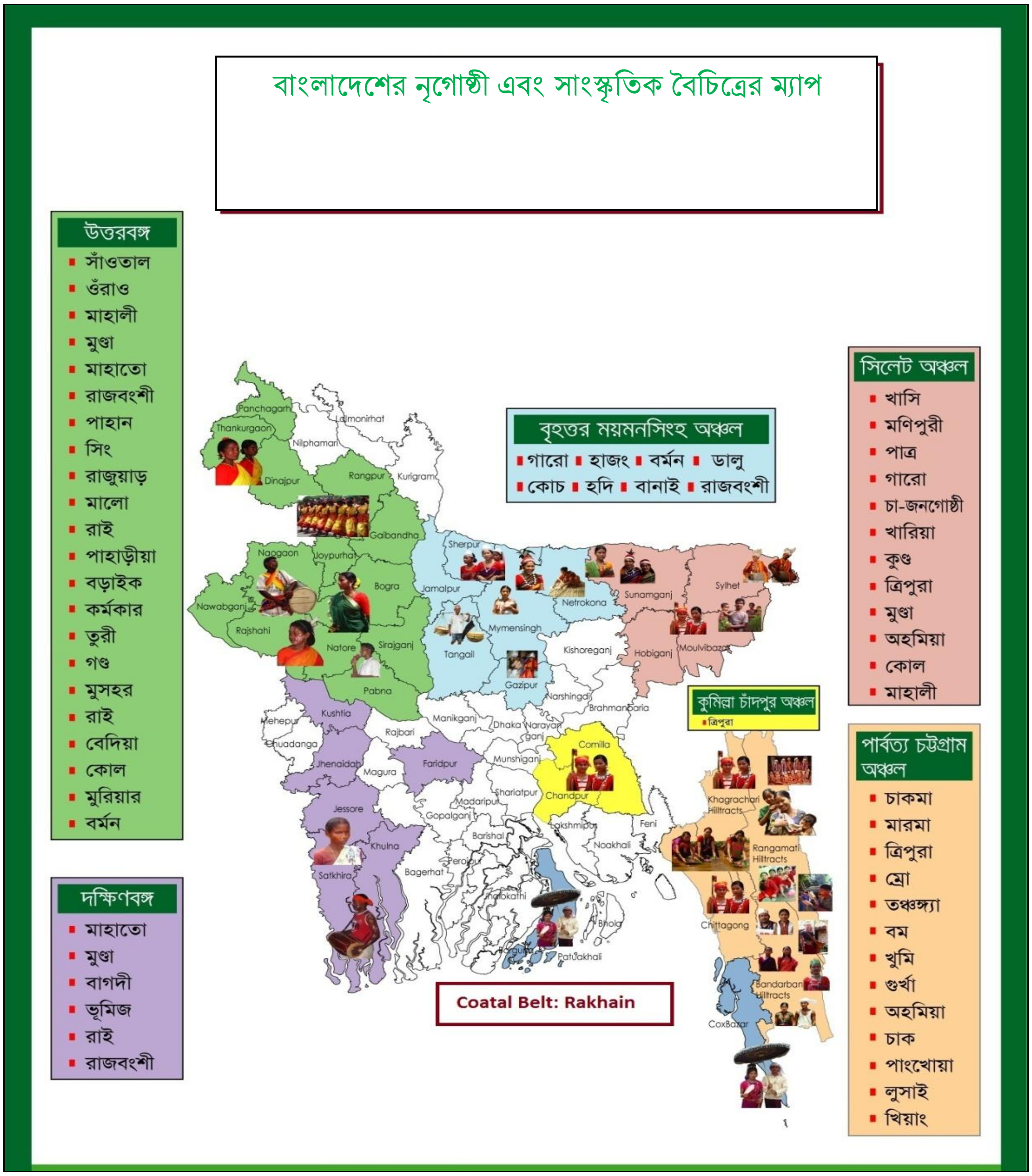

- পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি) ; এখানকার প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হ'ল – চাকমা, রাখাইন, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চগ্যা, ম্রো, লুসাই, খিয়াং, খুমি, চাক, পাংখুয়া, বম, সাঁওতাল, রাখাইন, অসম / অহমিয়া এবং গোর্খা ।

সর্বোপরি বাংলাদেশের উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোর অবস্থা দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে প্রান্তিক । নিম্নের ছকে এদের অবস্থা তুলে ধরা হ'ল :

বক্স - ১ বাংলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আর্থ-সামাজিক তথ্য
• জাতীয় গড় অবস্থার তুলনায় দারিদ্র্যের হার বেশী (প্রায় ৩০%) : পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬৫% এবং সমতল অঞ্চলে ৮০% এর বেশী । • গড় আয়, জাতীয় গড়ের চেয়ে কম (৮৪,০০০ টাকা) : পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৬% এর কম । অন্যদিকে সমতল অঞ্চলে ৪১% এর কম । • কৃষিখাতের উপর অধিক নির্ভরশীলতা : (সমতল অঞ্চলে ৮০% এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭২%) • বেতনভুক্ত চাকুরী / ব্যবসা ; পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩% যা সমতল অঞ্চলের তুলনায় ১% কম । • সমতল এলাকায় গড়ে দুই তৃতীয়াংশ উপজাতীয় মানুষ কার্যতঃ ভূমিহীন । এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি সম্প্রদায়ের হার আরো বেশী (সাঁওতাল, মাহাতো এবং পাহান ইত্যাদি) ৯৩% এর মত । • পার্বত্য চট্টগ্রামের এক তৃতীয়াংশ উপজাতীয় জনগণ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল, বিভিন্ন পর্যায়ে যা স্থানান্তর / কর্তন এবং পোড়ানো / সুইডেন পদ্ধতির চাষাবাদ হিসেবে পরিচিত । • সার্বিকভাবে উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো (দক্ষিন ও পশ্চিম) খুব বেশী মাত্রায় প্রান্তিক এবং দরিদ্র । • ঋণ / ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে : মহাজনদের কাছ থেকে ধন গ্রহণ (১০%) সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে (৫৪%), সমতল অঞ্চলে (৬২%) ।

(সূত্র : ইউএনডিপি / সিএইচটিডিএফ (২০০৭) এবং অক্সফাম এর বেস লাইন জরীপ (২০০৯)

৭। এফটিপিপির জন্য আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের সংবিধান এদেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে । সংবিধানের ২৭ তম অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিককে সমতার নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ২৮ ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি এবং জন্মস্থান নিরবিশেষে সকলের ক্ষেত্রে বৈষম্য রহিত করেছে । একই অনুচ্ছেদ দেশের পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' গ্রহণেরও বিধান রেখেছে ।

সংবিধান ছাড়াও বাংলাদেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত ব্যবস্থা বিষয়ক একটি কর্পাস রয়েছে যা এদেশে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে । এই কর্পাস মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে ; তবে, সমতল ভূমিতে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু আইনও বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে । এসকল আইনের কয়েকটি ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাশ করা হয়েছে (তবে এখনও বলবৎ রয়েছে), কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব আইনের মধ্যে অধিকাংশ আইনই গৃহীত হয়েছে এবং ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট আইনগুলো পাশ হয় ।

৭.১ আইনি কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ যা সাধারণভাবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল ১৯০০' হিসেবে পরিচিত এবং এটি হচ্ছে প্রাচীনতম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্ধৃত আইন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মাধ্যমে এই আইনটি প্রণীত হয় এবং এটি ভূমি এবং রাজস্ব প্রশাসন, ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা (যেমন বাংলা ভাষায় অতি জনপ্রিয়ভাবে ডাকা হয়ে থাকে সার্কেল প্রধান বা রাজা), জুম চাষ সহ সনাতনী ভূমি অধিকার এবং মেয়াদি পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রথাগত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিরোধসমূহের প্রশমন ও নিস্পত্তিকে সংজ্ঞায়িত করে থাকে। পরবর্তী দশকগুলোতে এই আইনটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়। তবে এখনও আইনটি বলবৎ রয়েছে এবং ভূমি প্রশাসন ও এতোদাঞ্চলের সনাতনী শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে থাকে।

সরকার ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস বা জেএসএস) এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ঐ পার্বত্য অঞ্চলে একটি স্বকীয় প্রশাসনিক কাঠামো (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটু ব্যতিক্রমী) জোরদার করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন প্রনয়ণ করা হয়। এই চুক্তিপত্র নিজেই এক ধরণের প্রায় আইনী দলিল হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (ধারা ৭.২ এর অধীনে বিস্তারিতভাবে বর্ণীত ; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো) পরবর্তী সকল আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এর তুলনায় সমতল এলাকার আদিবাসী জনগণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা আইন নং ২৮) এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ; এটা সমতল এলাকায় স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে উপজাতীয় জনগণের ভূমি যারা উপজাতীয় নয় তাদের নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদানের মধ্যদিয়ে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী গুলোর ভুমি অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে (আইনে এই গোষ্ঠী আদিবাসী হিসেবে অভিহিত)। অধিক প্রভাবশালী এবং ব্যবস্থা প্রতিপত্তি সম্পন্ন অ-আদিবাসী ব্যক্তিদের দ্বারা আদিবাসী জনগণের জমি বেদখল হওয়া প্রতিরোধ করার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ আইনসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপজাতীয় / আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আধিকার রক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রায় সকল ধরনের প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক দলীল দস্তাবেজে স্বাক্ষরকারী দেশ। অধিকন্তু বাংলাদেশ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১০৭ এ স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্র। তবে বাংলাদেশ এখনও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করে নি, যেমন কনভেনশন নং ১৯৮৯ এর ১৬৯। এছাড়া বাংলাদেশ নির্ধারিত সেই সকল দেশ সমূহের অন্যতম যারা ২০০৭ সালে আদিবাসী জনগণের অধিকার (ইউএনডিআরআইপি) সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণায় ভোট প্রদান করা থেকে বিরত ছিল। নিম্নোক্ত টেবিলে এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হ'ল (দু'টি প্রাসঙ্গিক আইএলও কনভেনশন এবং ইউএনডিআরআইপিকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)

ক্রমিক নং	চুক্তি / কনভেনশন সমূহের নাম	জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার বৎসর	বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরের বৎসর
১	জাতিগত সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি	১৮৬৫	১৯৭৯
২	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি	১৯৬৬	২০০০
৩	অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি	১৯৬৬	১৯৯৮
৪	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি	১৯৭৯	১৯৮৪
৫	নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী চুক্তি	১৯৮৪	১৯৯৮
৬	শিশু অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি	১৯৮৯	১৯৯০
৭	জীব বৈচিত্র সংক্রান্ত চুক্তি	১৯৯৩	১৯৯৪
৮	আদিবাসী এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১০৭	১৯৫৭	১৯৭২
৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ	২০০৭	২০০৮

১০	আদিবাসী জনগণের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা	২০০৭	বিরত থাকা
১১	আদিবাসী এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯	১৯৮৯	এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি

এইচএনপি খাতে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করছে যেমন: স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ; বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ ; বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ; এবং এইচএনপি খাত কর্মসূচি । এসকল নীতিমালা দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ণ এবং দেশের পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগণ বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুঃস্থ সম্প্রদায় সমূহ (উপজাতীয় জনগণ) যাতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ ও প্রাপ্তি সহজলভ্য করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছে । বস্তুতঃ এই নির্দেশিকাগুলো একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলা, পরিসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, একটি প্রাপ্য অধিকার ভিত্তিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেষ্ট আচরণের উন্নয়ন, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করণ, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং সরকারি ও বে-সরকারি উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব প্রদান করে থাকে ।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি-২০১১

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি – ২০১১ স্বীকৃত মানবাধিকার এর অংশ হিসেবে এইচএনপি সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখে । সবার জন্য সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে হলে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে । ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর (উপজাতীয় জনগণ) প্রয়োজনসমূহ পূরণে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি – ২০১১ এবং এর পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনাসমূহ সর্বাধিক উদ্ধৃত আইনী দলীল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে ।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি-২০১২

এই নীতি দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগণ (উপজাতীয় জনগণ) সহ লিঙ্গ ভেদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানে ভূমিকা রাখছে । নীতিমালাটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ; লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণে কর্মসূচি জোরদার করা ; জনগণকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়গুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ; সকল স্তরে পরিবার পরিকল্পনা সহ প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করা ।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি নীতি (এনএনপি)-২০১৫

এই নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মা ও কিশোরী মেয়ে এবং শিশুদের পুষ্টিগত মানোন্নয়ন ; এবং জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা । এনপিপি – ২০১৫ এর লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণের পুষ্টিগত মানোন্নয়ন, অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং জীবনমান উন্নত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ।

৭.২ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো

সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সম্পাদনের এবং তদারকী এবং ঢাকাস্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধান উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ক্ষেত্রে, এটি গোটা অঞ্চলের জন্য ‘উন্নয়ন পরিষেবার প্রবেশদ্বার’ হিসেবে কাজ করে ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে । ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (সিএইচটিআরসি বা আরসি) গঠন করা হয় । পার্বত্য অঞ্চলে সরকারিউন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডের ‘সমন্বয় ও তদারকির’ মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয় এই পরিষদকে । এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর জাতীয় সংসদে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রনয়ণের মধ্যদিয়ে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ির সাবেক স্থানীয় জেলা পরিষদগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদে (এইচডিসিস) এ রূপান্তরিত হয় ।

সামান্য কিছু পার্থক্য ব্যতিরেকে এই সকল পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা ও কার্যক্রম মূলতঃ সমধর্মী ; বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন ছাড়াও উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই পরিষদ প্রধান সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয় । সবকিছু মিলিয়ে এই পরিষদের উপর হস্তক্ষেপের ৩৩ টি বিষয় বাস্তবায়ন ও তদারকীর দায়িত্ব অর্পন করা হয় যা 'হস্তান্তর বিষয়াবলী' হিসেবে বহুল পরিচিত। এখন পর্যন্ত সরকার বেশ কয়েকটি সংস্থা / বিভাগের 'হস্তান্তর যোগ্য বিষয়াবলী' আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে এর মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত গ্রাম কারবারি, মৌজা হেডম্যান এবং সার্কেল প্রধানের সমন্বয়ে গঠিত প্রথাগত প্রতিষ্ঠান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । গত কয়েক দশকে, বিভিন্ন আইন প্রনয়ণের মধ্যদিয়ে এসকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং কার্য ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে । তবে ভূমি এবং রাজস্ব প্রশাসন এবং প্রথাগত বিচার কার্য পরিচালনার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা এখনও আইনানুগভাবে এদের হাতে রয়ে গেছে । সমভূমি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় সম্প্রদায় সমূহের গতানুগতিক সামাজিক কাঠামো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার মত বলবৎ থাকলেও এদের আইনগত কোন স্বীকৃতি এখানে নেই ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) এর বিপরীতে এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সমভূমীতে বসবাসরত উপজাতীয় গোত্রগুলোর মাঝে নেই বললেই চলে । ১৯৮৯ সালে অন্যান্য কিছু বিষয়ের মতো স্পেশাল এফেয়ারস ডিভিশন (এসএডি) গঠন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) এবং উপজাতীয় জনগণের দায়দায়িত্ব এর অধীনে ন্যাস্ত করা হয় । কিন্তু ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় (মোসিএইচটিএ) গঠন করার পর এটা বিলুপ্ত করা হয় । এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এর একজন কর্মকর্তা সমভূমি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় সম্প্রদায় গুলোর সমস্যাবলী দেখাশুনা করার দায়িত্বে রয়েছেন এবং তার প্রধান দায়িত্বের মধ্যে নির্ধারিত জেলা ও উপজেলাসমূহে সরকারিঅনুদানের অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের অনুযায়ী, এর মধ্যে ৩৬টি জেলার ৬২টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), এসকল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতীয় জনগণের বসবাস রয়েছে । মাঠ পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) এর পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এই অনুদান প্রদান কার্যক্রম তদারকী করে থাকেন যা মূলতঃ উপজাতীয় জনগণের মাধ্যমে পরিচালিত এনজিওস / সিবিওস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে । সমগ্র কর্মযজ্ঞটি একটি কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় । উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এর সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটিতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারিপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন এবং ডেপুটি কমিশনার মনোনীত এক অথবা দুই জন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন ।

৮। মত বিনিময় এবং অংশগ্রহণ

বস্তুতঃ এফটিপিপিপি এর উদ্দেশ্যাবলী অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করে এইচএসএসপির কর্মকান্ড নির্বাচন, নক্সা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উপজাতীয় জনগণের (টিপি) এর অংশগ্রহনের উপর । উপজাতীয় জনগণের (টিপি) এর উপর বিরূপ প্রভাব অত্যাসন্ন হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) ক্ষতিগ্রস্থ টিপি সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ আলোচনা ও পরামর্শক্রমে এইচএসএসপি কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। । এধরণের আলাপ আলোচনায় উপজাতীয় জনগণের (টিপি) এর সঙ্গে কাজ করছেন এবং / বা উপজাতীয় জনগণের উন্নয়নের ব্যাপারে সম্যক ধারণা রয়েছে বা সচেতন রয়েছন এমন ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করা হয় । একটি কার্যকর অংশগ্রহণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) কর্মসূচির বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ উপজাতিয়দের সহিত আলোচনার জন্য একটি সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করা হয় । প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে এই প্রকল্পের কর্মকান্ডের প্রতি ব্যাপকভিত্তিক গোষ্ঠীগত সমর্থন রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা এবং সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কিংবা হ্রাস করার ব্যাপারে উপজাতীয় জনগণের (টিপি) কাছ থেকে তাদের মতামত / প্রতিক্রিয়া জানা ; বিরূপ প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করণ ; এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি পরীক্ষা-নিরিক্ষা এবং বাস্তবায়নপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) উক্ত বিরূপ প্রভাব প্রশমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । উপজাতীয় জনগণের (টিপি) কাছ থেকে ব্যাপক ভিত্তিক গোষ্ঠীগত সমর্থন না পেলে সে ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ঐ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অর্থায়ন অব্যাহত রাখবে না ।

গোষ্ঠীগত সমর্থন আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিনামূল্যে, পূর্ববর্তী এবং অবগত পরামর্শ কার্যভার পরিচালনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) নিম্ন লিখিত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে:

- উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি) সমূহের ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেখানে তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক লিঙ্গ এবং প্রজন্ম ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে ; প্রথাগত / ঐতিহ্যগত উপজাতীয় (টিপি) সংগঠনসমূহ ; সম্প্রদায়ের প্রবীণ / নেতৃবৃন্দ ; এনজিও এবং সিবিওর মত নাগরিক প্রতিষ্ঠান্সমূহ ; এবং সেই সকল গ্রুপ যাদের উপজাতীয় জনগণের (টিপি) উন্নয়ন এবং উদ্বেগের ব্যাপারে রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞান ।
- তাদেরকে বড় ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব সহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকজন (টিপি) যাতে তাদের মতামত এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরতে পারে সেই ধরণের আলাপ আলোচনার আয়োজন এবং পরিচালনা করা ।
- সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সকল আলোচনা সভার কার্যবিবরণী ব্যাংককে প্রদান এবং মত বিনিময়, প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের প্রতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের (টিপি) দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্ট প্রভাব, বিশেষ করে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সমূহ ; উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি) এর দেয়া পরামর্শ / প্রতিক্রিয়া সমূহ ; এবং আলোচনায় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কোন বিষয় থাকলে তা উল্লেখ পূর্বক কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত করা যা তাদের ব্যাপক ভিত্তিক সম্প্রদায়ের মৌলিক ভিত হিসেবে কাজ করবে ।

এই উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা কাঠামোর (এফটিপিপি) প্রস্তুতির অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । অংশগ্রহোনকারীদের মধ্যে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এর পাহাড়ি জেলা পরিষদের পাশাপাশি বাংলাদেশের সমতল এলাকার জাতীয় আদিবাসী পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল । আলোচনা সভার মধ্য থেকে যে সকল পরামর্শ ও সুপারিশমালা উত্থাপিত হয় সেগুলো এফটিপিপি এর চূড়ান্ত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় । মতবিনিময় সভার আলোচিত বিষয়ের সারাংশ এবং অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা সংযোজনী – ৫ এবং ৬ এ তুলে ধরা হ'ল –

৯। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কর্মকান্ড জোরদারে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা সমূহ

ক) উপজাতীয় জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত পার্থক্য সমূহের স্বীকৃতি প্রদান, পরিষেবা কভারেজ এর উন্নয়ন ।

- উপজাতীয় / জাতিগত সংখ্যালঘু এলাকায় সিসির মাধ্যমে পরিচালিত সেবা কভারেজ পর্যালোচনা করা । যে সকল পরিবার নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত অথবা পানি প্রবাহ / নদ-নদী / খাড়া ঢাল / স্যাটেলাইট ক্লিনিক অথবা মোবাইল ক্লিনিক দ্বারা বিচ্ছিন্ন সেই সকল পরিবারকে এই কভারেজের আওতায় আনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
- শূণ্যস্থান পূরণে সরকারি খাতের অবকাঠামো এবং পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে সহায়তা করা এবং পরিষেবাগুলোকে আরো ব্যবহার বান্ধব করে তোলা । যদি প্রযোজ্য হয় সে ক্ষেত্রে, কমিউনিটি পর্যায়ে বেসরকারি খাতকে কাজে অন্তর্ভুক্তির মদ্যদিয়ে সরকারি খাতের পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থাকে আরো পূর্ণতা দান করা ।
- অধিকতর ভাল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে মানব সম্পদের উন্নয়ন ।

খ) আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) পরিকল্পনা : ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী এবং অসহায় সম্প্রদায়গুলো (উপজাতীয় জনগণ) এর চাহিদা সমূহ পুরণ করতে সক্ষম এমন একটি বিসিসি পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে । এই পরিকল্পনা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের বিদ্যমান বিসিসি নীতিমালা সমূহ / নির্দেশিকা সমূহ দ্বারা পরিচালিত হবে যার লক্ষ্য হবে সব ধরণের সমস্যা বিশেষ করে প্রচলিত সামাজিক – সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের সমাধান যা এইচএনপি পরিষেবা প্রদান কার্যক্রমের সংবেদনশীলতাকে আরো উন্নত করে তোলার সম্ভাবনা তৈরী করবে ; যোগাযোগের সকল চ্যানেলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচারণের অবয়ব বৃদ্ধি করা (ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রেস, হোরডিংস, হ্যান্ড বিলস, পোষ্টারস এবং সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মাধ্যমে আন্তঃ ব্যক্তিক যোগাযোগ ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ; এবং স্বাস্থ্য কর্মী, ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিকিৎসা প্রদানকারী, কমিউনিটি এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রভাবশালীদের জন্য বিষয়বস্তু এবং বার্তাসমূহ বিবেচনায় এনে লক্ষ্যভেদী প্রচারণা তৈরী করা ।

গ) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

- প্রশিক্ষণ ও ঔষধের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে কাজ করা এবং চিকিৎসা মেডিসিন প্র্যাকটিশনার্সদের উপজাতীয়/জাতিগত ব্যবস্থা।
- একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর রেফারেল পদ্ধতির উন্নয়ণ।
- সম্পদের উত্তম ব্যবহার জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য বিভাগের (যেমন বন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি) সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা।
- সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সংবেদনশীল পদ্ধতিতে দ্বন্দ নিরসন ও দুর্দশা লাঘবের ক্ষমতা এবং অভিযোগকারীদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক সংঘাত চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং সমাধানের ক্ষমতা।

ঘ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুঃস্থ সম্প্রদায়গুলোর (উপজাতীয় জনগণ) সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথাগত নেতৃবৃন্দ যাতে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারেন তার জন্য শক্তির যোগানদান। আশা করা হচ্ছে এনএইচপি সেবার উন্নয়ণ এবং বাস্তবায়নে প্রথাগত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন। তারা অত্যন্ত সম্মানিত এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের উপলব্ধি রূপায়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখেন। বাস্তবায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে এসকল প্রথাগত নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যের দাবী রাখে। বিশেষ করে এর কারণসমূহ নিম্নরূপ –

- সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অনুরোধ করা।
- সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং তথ্য প্রচার প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- এইচএনপি কর্মকান্ড সমূহ বাস্তবায়ণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- সম্প্রদায়গুলোকে সংগঠিত করার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করা।
- মানুষকে মান সম্মত সেবা ব্যবহার থেকে দূরে রেখে তাদের বিভ্রান্ত করা এবং তাদের মাঝে ভুল ধারণা তৈরির বিষয়টি কাটিয়ে ওঠা।
- সেবা দানকারী এবং সম্প্রদায়ের জন্য পরামর্শকের ভূমিকা পালন করা।

ঙ) সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

- নাগরিকদের মাধ্যমে পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে অধিক হারে যাতে জনগণ বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুঃস্থ সম্প্রদায় (উপজাতীয় জনগণ) অংশ গ্রহণ করতে পারে তা সহজতর করার লক্ষ্যে অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে বিরাজমান নাগরিক জমায়েত পদ্ধতি জোরদার করা প্রয়োজন।
- এইচএসএসপি'র অধীনে পাঁচটি ডিএলআইস লিঙ্গ ভিত্তিক অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ডিএলআই # ৯ এর লক্ষ্য হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মহিলা ধাত্রী নিয়োগ দেয়া যা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে সেবা প্রদান কর্মকান্ডকে অধিক হারে নারী বান্ধব করে তুলতে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে ; ডিএলআই # ১৩ ঠিক শিশু জন্মের পর বিবাহিত দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা দানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রস্তুতি বৃদ্ধি করবে ; ডিএলআই # ১৪ জরুরী ধাত্রী সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ; ডিএলআই # ১৬ এর লক্ষ্য হচ্ছে কিশোরী মেয়েদের জন্য স্কুল ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করা ; অন্যদিকে ডিএলআই # ১৭ মা ও অন্তঃসত্তা মহিলাদের পুষ্টি সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করবে।
- ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী ও দুঃস্থ সম্প্রদায়ের (উপজাতীয় জনগণ) চাহিদাসমূহ পূরণের কর্মকান্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক কার্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
- সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি, লবনাক্ততা বেড়ে যাওয়া, উপর্যুপরি জলচ্ছাস এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি সহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্বাস্থ্যগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী ও দুঃস্থ সম্প্রদায়ের (উপজাতীয় জনগণ) এর বসবাস রয়েছে এমন সব অঞ্চলগুলোতে।

চ) তথ্য প্রকাশ এবং স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ পদ্ধতি - ডিএলআই # ১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের (এমওএইচএফডব্লিউ) এর দুর্দশা লাঘব কৌশল শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে যা দুর্দশা সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্য প্রাপ্তি এবং তা সমাধানের সক্ষমতা দান করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও প্রকাশকে উন্নত করবে। এমওএইচএফডব্লিউ জনগণের

প্রতিক্রিয়া জানা এবং বিশেষতঃ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দুঃস্থ সম্প্রদায় (উপজাতীয় জনগণ) এর সঙ্গে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ অব্যহত রাখার জন্য বিদ্যমান নাগরিক অংশগ্রহণ কৌশল ব্যবহার করবে।

১০। বাস্তবায়নের ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মনোনীত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা এফটিপিপি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। মনোনীত কর্মকর্তা (আদিবাসী জনগণ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী হতে পারেন অথবা উন্মুক্ত পদ্ধতিতে নিয়োগ পেতে পারেন। তার দায়িত্ব হবে এফটিপিপি এর বিভিন্ন বিধি-বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যখন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার ফলে সামাজিক রক্ষাকবচ হিসাবে তা বিবেচিত হবে এবং সে জন্য উপজাতীয় লোকদের পরিকল্পনা প্রয়োজনমত তিনি প্রস্তুত করবেন।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্থান নির্দিষ্ট টিপিপি প্রস্তুত করবে (প্রয়োজন হলে) যেখানে উপজাতীয় লোকজন অধিক সংখ্যক বসবাস করে। এইচএসএসপি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যে থাকবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও এইচডিসিস কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলে টিপিপিস বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঐতিহ্যগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের প্রবীণদের থেকে প্রতিনিধিরা জড়িত হবে। নারী এবং উপজাতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে।

এছাড়াও সম্ভাব্য টিপিপিস উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেহেতু অনেক উপজাতীয় জনগণ প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায় বসবাস করে।

১১। অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা

ক্ষোভ ও অভিযোগের সঠিক উৎস অজানা থাকবে যতক্ষণ না সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা হয়। বাংলাদেশ সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে বিশ্বাস করে। সে জন্য ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। তথ্য অধিকার সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাও তা বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকার সংক্ষুব্ধের অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকার পাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল (http://www.grs.gov.bd/home/index_english) তৈরি করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রতিকারে যথার্থ ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর এবং ফোন, ক্ষুদ্র বার্তা ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন মাধ্যমে ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রশমনের ব্যবস্থা করেছে।

যাইহোক, ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরভাবে এখনও গড়ে উঠে নি। সেবা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষোভ ও অভিযোগের উপর সীমিত তথ্য পাওয়ায় প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এইচএসএসপি'র অধীনে ডিএলআই নং-১ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জিআরএস শক্তিশালীকরণে সাহায্য করবে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণ বাড়বে এবং জনসাধারণের নিকট স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ক্ষোভ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করণে আবেদনপত্রে এফটিপিপি নির্দেশিকা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তার প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রশমনে একটি ব্যবস্থা চালু করবে। ঐক্যমতের ভিত্তিতে, এই প্রক্রিয়াগুলে বিভিন্ন সমস্যা/দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা রাখবে এবং কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ব্যয়বহুল ও বিলম্বিত আইনি প্রক্রিয়া হতে রক্ষা করবে। তবে জিআরএস বাদীর আইনি আদালতে সমাধান চাওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে, যে সব অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে সে সব অঞ্চলে জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন করবে এবং পরামর্শ মোতাবেক নিম্নেরূপে কমিটি গঠন করা হবে:

জিআরসির সদস্যপদ

সিভিল সার্জন/সিএইচটির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এইচডিসি সদস্য ------------------------ আহ্বায়ক।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান --সদস্য।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান -- সদস্য ।

স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিনিধি -------------------------- সদস্য ।

উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি) এর দুই জন সদস্য (১ জন পুরুষ ১ জন নারী) ----------- সদস্য ।

সিবিওর একজন প্রতিনিধি (সমভূমি অঞ্চলের উপজাতীকে প্রাধান্য দেয়া হবে) --------- সদস্য ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে (সিএইচটি) সনাতনি প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি --------------------সদস্য ।

জিআরসির উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিকভাবে অভিযোগ এবং দুর্দশা তুলে ধরার পাশাপাশি নিরপেক্ষ শুনানি ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা । জিআরসির সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি) কোন প্রথাগত দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থা মেনে চলতে থাকলে সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে । ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি যদি নারী হন সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) একজন নারী ইউপি সদস্য অথবা নারী মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড কমিশনারকে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য তলব করবে । জিআরসিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারীদের উৎসাহিত করা হবে ।

স্থানীয় পর্যায়ে কোন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিফল হলে, জিআরসি শুনানির আলোচ্যসূচী সহ ঐ অভিযোগনামা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) এর যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা) বরাবরে প্রেরণ করবে । আশা করা যায় এই প্রকল্পের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ যুগ্ম সচিব উপজাতীয় জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন এবং তিনি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিবের নির্দেশনা গ্রহণ পূর্বক ঐ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন । শুনানি অথবা পুনর্বিবেচনার যে কোন পর্যায়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির / ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) এর উপর বর্তাবে ।

স্থানীয় পর্যায়ে সকল মামলা গৃহীত হওয়ার চার সপ্তাহের মধ্যে শুনানি সম্পন্ন করতে হবে । মন্ত্রনালয় পর্যায়ে অনিস্পন্ন মামলাগুলোর ব্যাপারে অনধিক চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং জিআরসিকে অবহিত করতে হবে ।

নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিযোগের উপর শুনানি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে । জিআরসি অভিযোগের বিস্তারিত বিষয়, নির্ধারিত মামলা গৃহীত কিংবা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণসমূহ এবং আভিযোগকারীর সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সিদ্ধান্ত নথিভূক্ত করে রাখবে । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) সমস্ত নিস্পন্ন ও অনিস্পন্ন অভিযোগ এবং ক্ষোভ রেকর্ড করে রাখবে এবং বিশ্বব্যাংকের চাহিবা মাত্র সেগুলো পুনর্বিবেচনার জন্য প্রস্তুত করে রাখবে ।

বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-বিশ্বব্যাংকের (ডব্লিউবি) অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্পের মাধ্যমে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বলে মনে করেন এমন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অথবা বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার পরিষেবা (জিআরএস) এ অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী নিরসনে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ দ্রুত সময়ের মধ্যে পুনর্বিবেচনার বিষয়টি জিআরএস নিশ্চিত করবে । বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা এবং প্রক্রিয়ায় বাধ্যবাধকতা না থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গ বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শন প্যানেলের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। সমস্যার বিষয়টি বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে সরাসরি আনার পর যে কোন সময়ে অভিযোগ পেশ করা যেতে পারে এবং ব্যাংকের এ বিয়য়ে প্রত্যুত্তর দেয়ার সুযোগ রয়েছে । বিশ্বব্যাংকের কর্পোরেট আভিযোগ প্রতিকার পরিষেবা (জিআরএস) এর নিকট কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা যায় সে সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দয়া করে ভিজিট করুন www.worldbank.org/grs বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শন প্যানেলের এর নিকট কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা যায় সে সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দয়া করে ভিজিট করুন www.inspectionpanel.org

১২ । জনসমক্ষে এফটিপিপি প্রকাশ

বিশ্বব্যাংকের ছাড়পত্র পাওয়ার পর উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি), সাধারণ জনগণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) এর মাধ্যমে বর্তমান এফটিপিপি প্রকাশ করা হবে । বাংলা এবং ইংরেজী উভয় ভাষায় এটা অনুবাদ করা হবে এবং এর সদরদপ্তর ও জেলা অফিস, প্রকল্প জেলা সমূহের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস এবং উপজাতীয় জনগণের সহজ প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন অন্যান্য স্থানে সেগুলো সহজলভ্য করা হবে । এছাড়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) এর ওয়েবসাইটে এফটিপিপি এর সম্পূর্ণ কপি এবং অনুদিত সার সংক্ষেপ পোস্ট করবে । পাশাপাশি এফটিপিপি এর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ জনগণ কোথায় এবং কিভাবে প্রবেশ

করতে পারবেন দু'টি জাতীয় দৈনিক (বাংলা ও ইংরেজী) এর মাধ্যমে তা অবহিত করবে। এমওএইচএফডব্লিউ বিশ্বব্যাংককে এর কান্ট্রি অফিস তথ্য কেন্দ্র এবং ইনফোশপে এফটিপিপি প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করবে। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে যাওয়া ভাষাটি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে যেটি হতে হবে সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সম্প্রদায় (টিপি) এর বোধগম্য। যদিও সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে বাংলা ভাষায় পড়া, লেখা এবং যোগাযোগ স্থাপন করার সক্ষমতা এই উপজাতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ট অংশের রয়েছে।

১৩। এফটিপিপি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন

বর্তমান এফটিপিপি বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) একটি সুনির্দিষ্ট বাজেট পদ্ধতি গড়ে তুলবে। এফটিপিপি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতাদি ছাড়াও এমওএইচএফডব্লিউ উপজাতীয় জনগণের জন্য এইচএসএসপি প্রকল্পের বাজেট থেকে আলাদাভাবে বাজেট বরাদ্দ করবে। প্রস্তুত হতে যাওয়া টিপিপির নির্ধারিত সাইটে এই বাজেট বরাদ্দের সুস্পষ্ট বিবরণী থাকতে হবে (যখনই প্রয়োজন পড়বে)।

১৪। এফটিপিপি / টিপিপি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

এফটিপিপির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের যথাযথ অনুষঙ্গা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ একটি অপরিহার্য বিষয়। আদিবাসী জনগণ/সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন বিষয়াবলী প্রস্তুত করবেন এবং এবং মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবেন। তারা প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ইউনিটের সঙ্গে একত্রে এইচএসএসপির জন্য পর্যায়ক্রমিক সুরক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করবেন। মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প অফিসগুলো থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহকৃত উপাত্তসমূহ সহ পর্যবেক্ষণের উপাত্তগুলো প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে।

এফটিপিপির যথাযথ বাস্তবায়ন তদারকির জন্য তৃতীয় পক্ষীয় পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে যাতে এফটিপিপি এর বিধান অনুযায়ী বৃহত্তর পরিসরে এইচএসএসপি কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।